আমার এক ছাত্রী এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষিকা- বিনয়ের সঙ্গে বললেন, স্যার আপনি তো এনসিটিবির পাঠ্যবইয়ের নানা ঝামেলা নিয়ে লিখে থাকেন। আমি কিন্তু বইগুলোতে কেন এত ভুল থাকছে এর কারণ বের করে ফেলেছি। শিশু শিক্ষার্থীর জ্ঞান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সবাই এত ব্যস্ত যে, তারা কোথাও পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারছেন না। আমি বুঝতে পারলাম না ও কী রহস্য করছে। শিক্ষিকা হাসতে হাসতে বললেন, এনসিটিবির কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক বিশেষজ্ঞরা শিশু শিক্ষার্থীদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য এখন নাকি ডাল রান্নার রেসিপিও পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আমি ভেতরে ভেতরে চমকে গেলেও ওকে বুঝতে দিলাম না। বললাম, অসুবিধা কী! জীবন চলার পথে এসব শিক্ষা কাজে লাগবে। এর পর তরুণ শিক্ষিকার বক্তব্য এমন- বাঙালি মেয়েরা যুগ যুগ ধরে দেখে দেখে বা অভিজ্ঞতায় এসব শিখে থাকে। শুধু মেয়ে কেন, অনেক ছেলেও আনন্দে বা প্রয়োজনে ভালো রান্না করে। তার জন্য পাঠ্যপুস্তকে রেসিপি শিখে আসতে হয় না। তা ছাড়া এখন ইউটিউবের কল্যাণে চাইলেই সব রেসিপি চলে আসে। আমি ওর কথার যুক্তি এতক্ষণে বুঝতে পারলাম। আর বুঝতে পারলাম এত সব নিরীক্ষা করতে গিয়ে শেষে সব কিছু ‘ডাইল’ (ডাল) হয়ে যাচ্ছে কিনা।

কয়েক বছর ধরেই পাঠ্যপুস্তকের ভুল নিয়ে মিডিয়ায় প্রামাণ্য রিপোর্ট ছাপা হচ্ছে। এসব ভীষণ ভয়ঙ্কর ব্যাপার। শিশু শিক্ষার্থীরা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মতো জাতীয় দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত ভুলে ভরা বই পড়ে বেড়ে উঠবে এ তো অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু এখন প্রতিবছর একই অপরাধ করে একে নিয়মে পরিণত করেছে যেন। গত বছর অমন ভুলের কারণ জানতে চেয়েছিলেন উচ্চ আদালত। পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যানকে কোর্টে তলবও করা হয়েছিল। এর পর আবারও আরও তেজি ভাবসহ অনেক ভুল তথ্য নিয়ে প্রকাশিত হয়ে গেল বই।

advertisement

এমন খবরে আমি কিছুটা বিস্মিত বটে। কারণ এই অঞ্চলে এক সময় আমার কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল। ১৯৯৬ সালে একবার আবার ২০১১ সালে আরেকবার মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন ও পাঠ্যবই রচনার কর্মযজ্ঞে আমি যুক্ত ছিলাম। আমি বিস্মিত হচ্ছি এজন্য যে, এনসিটিবির গ্রন্থের কারিকুলাম তৈরি পাঠক্রম প্রণয়ন, গ্রন্থ রচনা এবং তা চূড়ান্তকরণ যেভাবে হয় তাতে এত সব ভুল থাকার কথা নয়। কারিকুলাম অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের বই লেখার জন্য একটি লেখক প্যানেল নির্বাচন করা হয়। একটি বই লেখার জন্য একাধিক লেখক নির্বাচিত হন। তারা স্কুলশিক্ষক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পারেন। এর পর থাকে এক বা একাধিক সম্পাদক। সাধারণত অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদরা এই দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পান। এর মাঝখানে থাকেন এনসিটিবির বিষয় অভিজ্ঞ কর্মকর্তারা। এভাবে বহু জোড়া চোখ আর মেধার নিরীক্ষণের মধ্য দিয়ে একটি পাণ্ডুলিটি পূর্ণতা পায়। তা হলে লেখকের কলম থেকে শুরু করে সম্পাদকের টেবিল পর্যন্ত কারও চোখে ভুলগুলো পড়ছে না কেন!

advertisement 4

আমি আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে কিছু উত্তর খুঁজে পাচ্ছি যেন। ১৯৯৬-এ বিএনপি শাসনের শেষদিকে বিদেশি অর্থ সহযোগিতায় এনসিটিবির বইগুলোর আমূল সংস্কারের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তাই ছোটদের পাঠ্যবই লেখার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন লেখক-সম্পাদক প্যানেল গঠনের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। যোগ্যতার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এভাবে মোটামুটি নিরপেক্ষভাবে যোগ্য লেখক-সম্পাদকদের পেয়ে যায় এনসিটিবি। সে সময়ের পাঠ্যপুস্তকে ভুল থাকার কথা শোনা যায়নি। শুধু ইতিহাস বইতে রাজনীতিকরা তাদের বাঁহাত ঢুকিয়ে একটি বড় সংকট তৈরি করেছিলেন। এর পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসা, অতঃপর আবার বিএনপির ক্ষমতায় যাওয়ার সময়ে বারবার এসব বইয়ের মুক্তিযুদ্ধের প্রাসঙ্গিক অধ্যায়ে দুপক্ষই অপ্রয়োজনে তাদের নখর বসাতে থাকে। স্কুল পাঠ্যপুস্তকে প্রবেশ করতে থাকে বিকৃতি। লেখকদের অন্ধকারে রেখে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় বিকৃত ইতিহাস লেখার দায়।

২০১১-তে নতুন শিক্ষানীতির আলোকে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের উপস্থিতিতে ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে নতুনভাবে 'বাংলাদেশ ও গ্লোবাল স্টাডিজ' নামে গ্রন্থ রচনার প্রস্তাব রাখা হয়। এই বইটির একটি বাংলায় নামকরণের প্রশ্ন উত্থাপিত হলে আমি তাৎক্ষণিকভাবে বাংলা নামকরণ করি 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়'। আমার সৌভাগ্য প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে মুদ্রার অপর বিকৃত পিঠটি উন্মোচিত হয়ে যায়। যদিও গ্রন্থটির জন্য নির্ধারিত সম্পাদক ছিল। সম্পাদনা করে পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করা হয়। কিন্তু এতে আহত হলের একজন প্রভাবশালী অধ্যাপক। তাকে এই কর্মযজ্ঞে যুক্ত না করায় ক্ষুব্ধতা প্রকাশ করেন। এই অধ্যাপককে বিবেচনা করা হয়নি যেহেতু বহু গ্রন্থের লেখক হলেও ছোটদের কারিকুলামভিত্তিক গ্রন্থ রচনায় তার অভিজ্ঞতা ছিল না বলে। কিন্তু প্রশাসনের উচ্চ পর্যায় অধ্যাপকের ক্ষুব্ধতাকে আমলে না এনে পারলেন না। তাই সম্পাদনার নতুন দায়িত্ব পেলেন তিনি। ছোটদের বইয়ে পাঠ সাজানোয় কিছু বিধিবদ্ধ নিয়ম আছে। লেখকদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ না করেই সব ঝেঁটিয়ে ফেলে দিতে লাগলেন। অনেক ভুল উপাদান যুক্ত করে একটি খর্বাকায় পাণ্ডুলিপি তৈরি হলো। কারিকুলামের নিয়ম-নীতি অগ্রাহ্য করা হলেও তা ছেপে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আমরা বিস্মিত হলাম, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ কারও খেয়ালখুশিমতো চাপিয়ে দেওয়া যায় দেখে। আমার ধারণা পাঠ্যপুস্তকে ভুলের পসরা এ সময় থেকে বাড়তে থাকে। এর পর থেকে লক্ষ করেছি মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ের লেখক-সম্পাদকদের জায়গায় এ ধারার গ্রন্থ রচনায় অভিজ্ঞ শিক্ষক অধ্যাপকদের বদলে অনেক ক্ষেত্রে নতুন নাম-পরিচয়ের মানুষ যুক্ত হচ্ছেন। তারা অনেকেই হয়তো নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুপণ্ডিত কিন্তু স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ লেখায় অনভিজ্ঞ। তথ্য ও বিন্যাসে ভুল থেকে যাওয়া তাই অনেকটা স্বাভাবিক। দীর্ঘদিন এনসিটিবিতে কাজ করা এক কর্মকর্তা আলাপ প্রসঙ্গে বলছিলেন, বেচারা চেয়ারম্যান মহোদয়কে বারবার আদালতে ছুটতে হয়। তার কী বা করার আছে। এখন যোগ্যতার দিকে না তাকিয়ে সবকিছু দলীয় দৃষ্টিতে দেখলে অসহায় দৃষ্টিতেই আমাদের তাকিয়ে থাকতে হয়।

প্রসঙ্গক্রমে আমার একটি কঠিন অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ল। অনেকদিন ধরে এ দেশের সচেতন মানুষের একটি দাবি ছিল। প্রতিযোগিতাহীনভাবে এনসিটিবির মতো একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান কোটি কোটি বই প্রকাশ করে যাচ্ছে। তাই দাবি ওঠে বেসরকারি প্রকাশনা সংস্থাকেও অনুমতি দেওয়া হোক। বাজারে একই বিষয়ে একাধিক বই থাকুক। গুণবিচারে শিক্ষার্থীরা বই কিনবে। তখনো সরকারের বিনামূল্যে বই বিতরণ কর্মসূচি চালু হয়নি। অবশেষে ২০০৫ সালে সরকার পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি বই এনসিটিবির পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে প্রকাশের অনুমতি দেয়। তবে শর্ত থাকে, অভিন্ন সিলেবাসে বই লিখতে হবে। প্রতি বইয়ের জন্য পাণ্ডুলিপির সঙ্গে ২০ হাজার টাকা জমা দিতে হবে এনসিটিবিকে। সম্পাদনা ও অনুমতিদানের জন্য গঠিত বোর্ডের খরচ মেটানো হবে এই টাকায়। কোনো পাণ্ডুলিপি অনুমোদন পেলেও প্রকাশককে অপেক্ষা করতে হবে। এনসিটিবি মূল্য নির্ধারণ করে দেবে। তার পর তারা ছেপে বাজারজাত করবেন। আমরা যারা এ ধারার বই লিখি প্রকাশকরা ছুটে আসতে থাকেন তাদের কাছে। আমি একটি প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনা সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলাম। প্রস্তুত করলাম নাইন-টেনের মানবিক বিভাগের 'বাংলাদেশ ও বিশ্বসভ্যতার ইতিহাস' বইটির পাণ্ডুলিপি। যে কারণে বর্তমান প্রসঙ্গে এই শীবের গীত তা বলছি, আমার বিচারে দলীয় দৃষ্টিতে নির্বাচিতরা অনেক সময়েই তীক্ষè মেধার পরিচয় রাখতে পারেন না। আমি এই বিবেচনাটিকে কাজে লাগালাম। অভিজ্ঞতায় জেনেছি বিএনপির সংস্কার কমিটির কাছে যে ছক রয়েছে তার দিকেই মনোযোগ রাখবে। অন্যদিকে চোখ যাবে না। 'বঙ্গবন্ধু' শব্দটি তারা রাখবেন না। তা ছাড়া ৭ মার্চের ভাষণের স্বাধীনতার ঘোষণা জ্ঞাপক লাইনগুলো ফেলে দেওয়া হবে। আমি পাণ্ডুলিপিতে 'বঙ্গবন্ধু' লিখতে থাকলাম। ভাষণের উল্লেখযোগ্য লাইনগুলো বহাল রাখলাম। উদ্দেশ্য এই, ছক সামনে রেখে কমিটি এই জায়গাগুলো কাটতে ব্যস্ত থাকবে। আমি অন্যভাবে কিছু ইতিহাসের সত্য যুক্ত করলাম যাতে বঙ্গবন্ধুর ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই সত্য খুদে শিক্ষার্থী ঠিক অনুভব করতে পারে। আমার বিশ্বাস ছিল এসব দলান্ধ মানুষ ছকের বাইরে আর দৃষ্টি দেবে না। শেষ পর্যন্ত ঘটলও তাই। অনুমোদন পেয়ে গেল বইটি। ইনার বাদে বই ছাপা হলো। এনসিটিবির দিকে তাকিয়ে রইল মূল্য নির্ধারণের জন্য। যথাসময়ে ছাড় পেলে বেসরকারি প্রকাশক ডিসেম্বরের শুরুতেই বই বাজারে দিতে পারত। এনসিটিবির চেয়ে এই বইয়ের কাগজ ছাপা অনেক বেশি মানোত্তীর্ণ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই এনসিটিবির বই বাজারে চলে যাওয়ার পর এনসিটিবি বেসরকারি প্রকাশকদের বইয়ের মূল্য নির্ধারণ করে দিল। যেহেতু দেশজুড়ে অভিভাবক, শিক্ষক, শিক্ষার্থীর অনেকেই জানে না বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও বই প্রকাশিত হচ্ছে, তাই এসব বই আর তেমন বিক্রি হলো না।

এমন সব ভেতরকার সংকট যারা জানেন তারা ভুলে ভরা পাঠ্যপুস্তকের কথা শুনে চমকে যাবেন না। কিন্তু আমরা এসব ক্রূর বাস্তবতা থেকে বেরোতে চাই। কোটি কোটি শিশু শিক্ষার্থী এমন সব অবহেলার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হোক তা কেউ চাইবে না। দলীয় জিকিরের ছেলেখেলা না করে প্রকৃত দক্ষ লেখক-সম্পাদক নির্বাচন করে এনসিটিবি তার পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের অতীত সাফল্য ফিরিয়ে আনুক।

ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ : অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

25
Shares